Belles-Lettre 2023, Vol. 1, pp. 122-148

বিভেদ, কাঁটাতার ও 'নাগরিক মডার্নিটি'র যন্ত্রণা কিংবা নাড়ির টানে সংখ্যালঘুর উজান যাত্রা : মিহির সেনগুপ্তের সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম

অর্পণ রায়চৌধুরী

প্রবহমান জীবনে মানুষের ভেসে যাওয়ার সীমানা নেই, সত্য। তবুও নাড়ির সাথে লেগে থাকা কোনো একটা শিকড় যোগাযোগ রাখে অদৃশ্য সুতোর মতো। কখনো বা ফল্গুর মত অন্তঃসলিলা সে। সময়ের নিক্তিতে কখনো প্রকাশ করে নিজেকে একটা প্রবল কান্নায়। কখনো মায়ের আঁচল খোঁজে, মনের ওপর জমে যাওয়া ধুলোর আস্তরণ থেকে অতীত খুঁজে আনার বেজুবান বাসনায়। কথার পিঠে কথা চাপিয়ে ধূম্রকূট অতীতের স্মৃতিরেণু মেখে সোনালি দিনের আয়না দেখার শখ মানুষকে অবশ করে বর্তমানের হাত থেকে দূরে টেনে নিয়ে। পরাঙ্মুখ বাঙালি সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারলেও, পারে না অনুভূতির দরাজ হাতছানি উপেক্ষা করতে। তাই তার বারবার ফিরে যাওয়া শেকড়ের টানে, মাটির কাছে, মায়ের কাছে। মা আর মাটির টান কতটা আবেগমন্দ্র তাঁরাই বুঝতে পারেন— যাঁরা ঘরছাড়া, বাস্তুচ্যুত, মাতৃ-আঁচল বঞ্চিত। সন্ধ্যার নদীতটে একা বনলতা সেন অপেক্ষা করে না মনের মানুষের, অপেক্ষা করে মা-ও, বালির বুকে সময় গুনতে গুনতে, সন্তানের ঘরে ফেরার বিলাপ আবহ নিয়ে। সন্তানের স্পর্শে নিজেকে আর একবার ভিজিয়ে নেওয়ার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায়। যে জানে সেই জানে সে অনুভূতি কেমন পাগলপারা। গলা জড়িয়ে পাশাপাশি সুখ-দুখের দুটো কথা আদান-প্রদানের বাঞ্ছাই তো সন্তানের কাছে সিদ্ধি। নাই বা থাকল মা, জরা-সময়ে ঝরে গেছে হয়তো বয়সের কাছে হার মেনে, তবুও তো মায়ের গন্ধ লেগে আছে সে মাটিতে, স্পর্শ লেগে আছে কোণায় কোণায়। সন্তানের কাছে এটাই তো স্বর্গ, এটাই তো সেই সিদ্ধির মোকাম, হোক না সে গঞ্জ কিবা পাণ্ডববর্জিত গাঁ।

জন্মের সুতো ছিঁড়ে গেছে দেশভাগের করাল ঘা'য়, ধর্মের নাকাড়ায় চঞ্চল প্রাণ কর্মের তাগিদে দেশ ত্যাগ করেছে অনেকগুলি বছর আগে। সংখ্যার অভিধায় সে যাই হোক না কেন, মাটির সোঁদা গন্ধ মিলিয়ে যায়নি মিহির সেনগুপ্তের 'শরীল' থেকে। তাই ফিরে ফিরে যাওয়া ভাটির টানে, মাটির কাছে। তাঁর জন্ম ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার কেওড়া গ্রামে (অধুনা বাংলাদেশের ঝালকাঠি

....

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়।

জেলায়)। আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ১৯৬৩ সালে দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসা, বাংলাদেশ জন্মের পরে ১৯৭১ সালে কীর্তিপাশার বাল্যসখীকে বিবাহ করতে যাওয়া, এর চৌদ্দ বছর পরে ১৯৮৬ সালের শরতে কয়েকজন আত্মীয় কুটুম মিলে সেই মাটি এবং তার মানুষদের সান্নিধ্য উপভোগ করতে[১] যাওয়ার কথাই মিহির সেনগুপ্তের (১৯৪৭-২০২২) আলেখ্য সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম। বইটিতে রয়েছে লেখকের জন্মভূমি ও পার্শ্ববর্তী শ্বশুরালয়ের গ্রাম কীর্তিপাশায় অবকাশ যাপনের কাহিনি। উপন্যাস হওয়ার ইচ্ছে নেই লেখাটির, বরং তা যেন বেদনা বিধুর কাহিনির আড়ালে নোনাজলে অতীত হাতড়ানোর কাঞ্চনালেখ্য।

ব্যাঙ্ককর্মী মিহির সেনগপ্তের লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ মধ্যবয়সে ১৯৯৩ সালে নাইয়া পত্রিকার মাধ্যমে। তার পর লেখালেখি করেছেন বর্তিকা, কালান্তর, কম্পাস ও অন্যান্য কিছু পত্রপত্রিকায়।তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল— বিষাদবৃক্ষ, ধানসিদ্ধির পরাণকথা, টিলা অরণ্যের পাকদণ্ডী, বিদুর, ভাটিপুত্রের পত্র বাখোয়াজি, উজানিখালের সোঁতা, টাঁড় পাহাড়ের পদাবলি, হেমন্ত শেষের পাখিরা, গোধূলি সন্ধির রাখাল, নীল সায়রের শালুক, একুশ বিঘার বসত ইত্যাদি। মিহির সেনগুপ্ত তাঁর আত্মজৈবনিক গদ্য বিষাদবৃক্ষ-এর জন্য ২০০৫ সালে ‘আনন্দ পুরস্কার। এর আগে ২০০২ সালে বাংলাদেশ শ্রুতি অ্যাকাডেমি সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম গ্রন্থের জন্য তাঁকে ‘শ্রেষ্ঠ রচনা’র পুরস্কারে সম্মানিত করেন। তাঁর লেখা মূলত স্মৃতি আলেখ্যমূলক। বার বার উঠে এসেছে দেশভাগ, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বাঙালির জীবনযাপন। বাল্য ও কৈশোরের ভূমি বরিশালকে তিনি কখনও ভুলতে পারেননি। তাই তাঁর লেখায় পাওয়া যায় বরিশালের ভাষা, বরিশালের আখ্যান।

আমরা মিহির সেনগুপ্তের আলেখ্য সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম বইটি অবলম্বন করে কথকের মনোজগতের আলোড়ন বিচার করার চেষ্টা করব দেশভাগ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, মুক্তিযুদ্ধ, সংখ্যালঘু সংকট আর শিকড়ের টানের নিক্তিতে। বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব তাঁর আবেগ, অনুভূতির ধারালো কুঠার কীভাবে অতীতের দরজায় আঘাত করছিল বারবার।

দুই.

১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ছ’বছরে একবার করে হলেও লেখক নাড়ির টানে নাগরিক চক্রব্যূহ ছিঁড়ে উপস্থিত হয়েছেন নিজের কোটিকে বাঁচানোর তাগিদ নিয়ে। নিজের কোটি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন—

আমার কোটি বলতে এখানে আমি শুধু সমতট বঙ্গীয় নস্টালজিয়াক্লিষ্ট মানুষকেই বোঝাচ্ছি না, বোঝাচ্ছি বৃহৎ বঙ্গীয় তামাম সেই সব মানুষদের যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর তথাকথিত আধুনিকতার স্রোতের ধাক্কায় শিকড়-বাকড় হারিয়ে নাগরিক পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আমাদের কোটির এই জনেরা ইতিহাসগত কারণেই এখনও লড়ে যাচ্ছে কবে তারা এই পঙ্ক থেকে মুক্তি পাবে এই আশায়। তাই সময়ের দলিল হিসেবে রেখে যাওয়া এই অক্ষর-শব্দ পদবন্ধসমূহ তাদেরই উৎসর্গ করি, যারা আমার সিদ্ধিগঞ্জের মোকামের অদ্যাপিও জাগ্রত মশালধারী। যারা ফকিরসাব, মোকছেদ, কার্তিক এবং ছোমেদের সঙ্গে এখনও উৎসবের রাত্রিতে উজাগর থাকে এবং দুঃখের রাত্রিতে অতন্দ্র থেকে যে-সব মহীয়সীরা রাত্রির কিনারায় এসেও স্নিগ্ধস্বরে আহ্বান করতে পারেন : ওরে তোরা কয়জন আছ, রাইত শ্যাষ অইয়া গেছে, বইয়া পড়, মুই তোগো খাইতে দিতাছি।[২]

আখ্যান জুড়ে রয়েছে মোকছেদ আলি হোটেলে আপ্যায়নের রীতি, মোকছেদের ফকিরসাবের চোখে দেশভাগ-মুক্তিযুদ্ধ-রাজাকারের অত্যাচার আর মুর্শিদি গানের সুর, গন্তব্যে পৌঁছে রসিক, খলিল ঠাকুর, কার্তিক সহ অন্যান্য মানুষের আত্মিকযোগ আর সর্বোপরি ছোমেদের জারিগান। সব মিলিয়ে গোটা আলেখ্য জুড়ে বাস্তবের সাথে অতীত রোমন্থনের গন্ধে ভুরভুর কীর্তিপাশার 'দুলাভাই' লেখক স্বয়ং। এখানে বিভাজনের গণ্ডি নেই, ধর্মের চুলোচুলি নেই। এখানের হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে পান করেন মানবতার বিশুদ্ধ নির্যাস। আলেখ্যের সামগ্রিক বিচারে না গিয়ে আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা দু-একটি বিষয়ে অল্প-স্বল্প গল্প করতে পারি। এই ধরুন—

- দেশভাগের কাঁটাতার, বিভেদের কাঁটাতার নাকি মুক্তিযুদ্ধের শাণিত অস্ত্র— মানুষকে রক্তাক্ত করার খেলায় নখরদন্ত কে?
- নাড়ির টানে দৃশ্যমান প্রতিবন্ধকতা 'জীবনে মডার্নিটি' আর অদৃশ্য শিকড়ের আলগা বিক্ষেপের অনুরাগ— একটি ডিস্টোপিয়ান সংঘর্ষ?
- সারা গায়ে ভিটেমাটির এসেন্স মেখে সংখ্যালঘু কে বা কারা?
- উজান যাত্রা কী?
- সিদ্ধিগঞ্জের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মোকামের অস্তিত্ব কী?

তিন.

দেশভাগের ব্রহ্মমুহূর্তের গলন্ত লাভার লেলিহান লাস্যের ক্রুর লোহিত লালায় জর্জর এক মার্তণ্ড থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম, আর ঠিক তার সপ্তদশ দিবসে রক্তাক্ত
মাতৃভূমিকে অবলম্বন করে কাহিনিকার মিহির সেনগুপ্তের জন্ম। ফলে, ধরে নিতেই পারি এক বিপন্ন সময়ে তাঁর আবির্ভাব। দেশভাগ একটা ব্রুটাল প্রসেস, আর তার হাত

ধরেই বারবার উঠে আসে এক একটি ভয়ংকর পরিণতি। দুই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলন-পীড়ন, ছিটমহল সমস্যা, কাঁটাতার, নো ম্যান্স ল্যান্ড, অ্যাডভার্স পজেশন, সীমান্তে থাকা মানুষের জীবনযন্ত্রণা ইত্যাদি। যদিও ছিটমহল সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়েছে ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই, এই বিষয়ে গবেষণায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক তথা বর্তমানে নদীয়ার পান্নাদেবী কলেজের অধ্যাপক ড. মহঃ লতিফ হোসেন মহাশয়, তবুও বাকি সমস্যাগুলি প্রশ্নচিহ্ন হয়েই থেকে গেছে আজও। সব সমস্যার কথা আমাদের ছোট আলোচনায় ধরা সম্ভব নয়, তাই কাঁটাতার নিয়েই কথা বলব শুধু।

কাহিনিকার মিহির সেনগুপ্ত প্রথমেই স্বীকার করেছেন ১৯৬৩ সালে আর্থিক সমস্যার কারণে[৩] তাঁকে জন্মভূমি ছেড়ে এপারে কলকাতায় চলে আসতে হয়েছে প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। অর্থাৎ সে সময় দেশভাগ (১৯৪৭ খ্রি:) আর মুক্তিযুদ্ধের (১৯৭১ খ্রি:) মাঝামাঝি সময়ের অর্থনৈতিক সংকটের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিবাহসূত্রে আট বছর পরে 'ফেলে আসা দেশটির পুনর্দর্শন' করলেও থাকেননি আর। এরপর ১৯৮৬-১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শারদীয় উৎসবে নিয়মিত যাতায়াত ঘটেছে। যাতায়াত যন্ত্রণার দৃশ্য মোকছেদ আলির জবানিতে ফুটে উঠেছে এভাবে—

> ভোর থেকে যে হুজ্জুত গেছে, তার তেতো ভাগটা খোলসা করে না বলতে পারার বেত্তান্ত। তা খোলসা মানুষ হয় ক্যামনে? সবাই তো কী এপার, কী ওপার— খালি কাজে ব্যস্ত। এদের যেন কাজ ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। কী অনাছিষ্টি। এই কাগজ দাও রে, এই পাসপোর্ট দাও রে। এই বাক্স খোলো রে। এইসব। আরে বাবা সুজন দুর্জন বোঝো, তারপর খোলাখুলি করো ...মুই জানি বডারে সুমুন্দির পোয়েরা পকেট উল্ডোয়ে কাড়িছে।[৪]

মোকছেদ মনে করে এই সমস্ত কিছুর পেছনে দেশভাগ দায়ী। দেশভাগ না হলে কোনো সমস্যাই আসত না জনজীবনে। সবাই নিজের মতো বেঁচে থাকবার অধিকার পেত। কথককে মোকছেদ আরও বলেছে—

> ... ওই যে ওপারে আপনাগো ফারাক্কা ব্যারেজ না কি এক বাঁশ পদ্মার সোগায় ঢুকোয়েছে সে-কারণ এপারের নদী খালের পুটকি শুগোয়ে আমসী। 'তো' মুই বুঝিনে। বষ্যাকালে যে এত পানির হুলুস্থুলু হয়, মোরগো মুরুব্বিরা তা ধইরে রাখতি পারেন না? ... আসলে বুঝিছেন, ওই বাঁশখান আপনের ভাগাভাগির বাঁশ। সুমুন্দির

পোয়েরা ওই যে একখানা মাগগে ঢুকোয়ে রাখিছে তার আর চারা নাই। মোকছেদ দেশ ভাগাভাগির প্রসঙ্গ তোলে। তার ধারণা এই ভাগাভাগির জন্যই মানুষের এত অভাব। জিনিসপত্রের এত দাম। তাছাড়া এই ভাগাভাগির জন্যই মানুষের নিয়ত খারাপ হয়ে গেছে।

এখন তারা ছাওয়ালপানদের চারডি প্যাট ভইরে খ্যাতি দেওনের কতাও ভাবতি পারে না।[৫]

দেশভাগের যে সমস্যার কথা বলতে গিয়ে বলা হল না, সে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গাড়ির চালক হাফিজের কথায়। মোকছেদ আলি সপরিবার কথককে নিয়ে ফকিরসাবের আস্তানায় নিয়ে যাওয়ার সময় হাফিজের গাড়ি ভাড়া করে। তার বাড়ির অবস্থা জানতে চাইলে সে জানায় তার বাবা বর্ডারে 'ব্ল্যাক করে। সময়ের আর নিয়মের অভিঘাতে রাষ্ট্র যখন জীবন আর মানুষের মাঝে বিভাজনের প্রাচীর তোলে তখন মানুষই তার অস্তিত্ব রক্ষার বিকল্প ব্যবস্থা করে নেয়। এটাই নিয়ম। আর তা যদি হয় বর্ডার তখন চাহিদার সাথে দর কষাকষি এক শ্রেণির স্বার্থান্ধ, অর্থলোলুপ মানুষ ফুলে ফেঁপে বড় হতে চায়। এটাও সমাজের দস্তুর, নীতি একথা স্বীকার করে না। পৃথিবীর সমস্ত ভর, সমস্ত শক্তি যদি কনস্ট্যান্ট হয়, তবে একজন বেশি খেলে অপরকে অভুক্ত থাকতে হবে। একজনের পেশির আস্ফালনের কাছে নির্বিরোধে মাথা নীচু করে দাঁড়াতে হবে অপরজনকে। দেশ-কাল-সীমার গণ্ডি পেরিয়েও এই সত্য বিবর্ণ হয়ে যায়নি মানুষের কাছে। মোকছেদের সাধারণ প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় তার বাবা ব্ল্যাক কারবার বা চোরাচালান কারবারের সাথে যুক্ত। এ সম্পর্কে সে জানায়—

> হারামের বিজিনেস ওডা। তা ছাড়া ঝঞ্ঝাট মেলা। মুই বাজানেরে কলাম, মোরে একখানা গাড়ি কিনি দেন। ডেরাইভারিডা জানা আছে। কইরে কইম্মে খাতি পারব। তা তেনায় কলেন, হাইলে চাষার পো, জমি জিরেত যা আছে তা দেখ। লাঙ্গলের মুড়ি ধইরে চাষের কামে লাইমে পড়। যদি না পার তো বেলেকে লামো, তোমার পয়সা পরে খাবে। মুই কলাম, হালহালুড়ি মুই করব তো ভাইগুলান যাবে কনে? আর বেলেক মুই করব না, ইনসাল্লা। তো দ্যাহেন এখন গাড়ি চালাই। পরের গাড়ি। বাজানে একখান সেকেনহ্যান কিনি দেতে পারতেন। দেলেন না। কী আর করি। এখন পরের গাড়িতি খাটতি খাটতি জান জেরবার। কিন্তু পয়সার মুখ দেখিতে পাই নে। যা পাই তা প্যাডে দিতিই শ্যাষ।[৬]

বাস্তবের প্রলোভনের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে হাফিজের বাবা, হেরে যায়নি হাফিজ। তাই সে পিতার বিরুদ্ধে, প্রচলিত স্রোতের বিপক্ষে সন্তরণের কৌশল আপন করে নিয়েছে। কথক এখানে দেশভাগের 'কুবাতাস'-কে কথক স্মরণ করেছেন প্রতি পদক্ষেপে। তাঁর মনে আছে যখন তিনি দেশ ছাড়েননি তখন দেখেছেন কত নৌকা এসে লাগত খালের ঘাটে, কত মানুষের আনাগোনা, দুই ভিন্ন ধর্মের পবিবারের একত্র সহাবস্থান। আর এখন তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেন অগণিত মানুষের উঞ্ছজীবন

দেশভাগ আর দেশ ত্যাগকে কেন্দ্র করে। অনেক অনেক দিন পরে ঘরের মানুষ, কাছের মানুষের কাছে ফিরে যখন ভুলে যাওয়ার অনুযোগ শুনতে হয় তখন ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস। কথকের ছোটবেলার সাথী নুরুদার স্ত্রীর অনুযোগের উত্তরে বলেন—

এ তো এ-দেশ ও-দেশের ব্যাপার। ব্যবধান দুস্তর। যাতায়াতের সুযোগ আরও দুস্তর। ভাবীকে সেকথা বুঝিয়ে বলতে গেলে ভাবী গলে জল। বলে, বুঝি তো বেয়াক, তমো মনডা পোড়ে। কী যে আছেলে আর কী যে অইলে, হেয়া যহন ভাবি তহন আর কিছু ভালো লাগে না ভাই।[৭]

‘ব্যবধান’ আর ‘যাতায়াতের সুযোগ’কতখানি ‘দুস্তর, বোঝাতে হয় না পাঠককে। এই দূরত্ব স্থানিক দূরত্ব নয়, মানসিক দূরত্ব। আর তা বেড়েছে বিভাজন-নিয়ম-রাষ্ট্রতান্ত্রিক পদ্ধতির পথ বেয়ে। তাই ‘অসুমার’আবেগ-অনুভূতি-ভালোবাসা হয়ে পড়েছে আইনের নিগড়ে বাঁধা অসহায় বধ্য জন্তুর মতো। ক্রোধ আছে, ক্ষমতা আছে, নেই শুধু উপায়।

একদিকে দেশভাগের সমস্যায় রিক্ত মানুষ অপরদিকে থাকা বিভাজনের জাঁতাকলে পিষ্ট হতে শুরু করেছে এবার। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে কতিপয় মানুষ, নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে নাকি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে— বোঝা দুষ্কর। তবে সেই দাঙ্গার লেলিহান শিখায় যারা পুড়ে মরল তারা আর কেউ নয়, সমাজের নিচু স্তরের মানুষ যাদের কাঁধে ভর করেই সভ্যতা এগিয়ে চলে সামনের দিকে। ফলে মুখ থুবড়ে পড়ল সমাজ, ছিন্নভিন্ন হল তার কায়া। এই অবস্থার ছবি লেখকের তুলিতে ধরা পড়েছে এভাবে—

এখানে এখন যে সব মানুষের বাস, পৃথিবীতে তাদের আর কোনো যাবার স্থান নেই। যাদের ছিল, তারা সব চলে গেছে। প্রথমে গেছে হিন্দুরা। দাঙ্গায়। দাঙ্গার ভয়ে। রুটি রুজির প্রয়োজনে। ভাগ্য ফেরাবার তাগিদে। তারপর শিক্ষিত মুসলমানজনেরা চলে গেছে নগরে, শহরে, ক্রমশ বহির্বিশ্বে, কুয়েত, সৌদি আরব, আবুধাবিতে। এভাবে এইসব গ্রাম ক্রমশ লক্ষ্মীছাড়া হয়েছে। শ্মশান হয়েছে। সুন্দর বাগান আগাছায় ভরে গেছে। জঙ্গল বেড়েছে। বাগানের নারকেল সুপারির সুন্দর আবেষ্টনীগুলো ধ্বংস হয়েছে। পুকুরগুলোর ঘাটে ফাটল ধরেছে, পানায় ভরে গেছে। সেই পানা পচে পচে একসময়ে পুকুরগুলো বুজে গেছে।[৮]

এই ফাটল পুকুরের ঘাটে হয়নি, হয়েছে মানুষের মনের গভীরে। জঞ্জাল-জঙ্গল মাতৃভূমিকে গ্রাস করেনি, করেছে মননের সহানুভূতিক জমিকে। বাগানের নারকেল বা সুপারির আবেষ্টনীগুলি শুধু নারকেল বা সুপারি গাছকেই রিপ্রেজেন্ট করে না, দুই ভিন্ন ভিন্ন মানুষকে জাতিকে এক আঁচলে বেঁধে রাখে।

মোকছেদ, ছোমেদ, ফণী, কার্তিক, অষ্টচরণ দাসের মতো মানুষরা দেশের খবর জানে না, বিশ্বের খবর জানে না। জানতে চায়ও না। তারা শুধু জানে তার পরিবার আর প্রতিবেশীকে। প্রতিবেশীর ধর্ম বা জাতি তার বিবেচ্য নয়, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী অস্তিত্বটাই। আর তারা জানতে চাইবেই বা কেন? চারিদিকে যখন দাঙ্গা-মুক্তিযুদ্ধের আগুনের ফুলকি উড়ছে তখন তাদের খবর তো কেউ রাখেনি, কেউ তো জানতে জানতে চায়নি তারা কেমন পরিস্থিতিতে বেঁচে আছে, খবরের বাতাসে তাদের গন্ধ ভাসে না তো, কাগজ ছাপায় না তো তাদের কথা। তারা যেন অন্য পৃথিবীর অন্য মানুষ। তাদের কাউকে হত্যার পূর্বে তো কেউ খোঁজ নেয় না প্রকৃত অপরাধী কিনা, অথবা সে যা বলেছে তার অর্থ কী? তাই তারা চেনে না বাইরের কাউকে, চেনে নিজেদের সমাজ আর প্রতিবেশীকে। তারা কষ্ট পায় পরিবার, প্রতিবেশীর অন্যায় হত্যাকাণ্ডে। এমনি একটা ঘটনা লেখক জানতে পারেন মোকছেদ আলির থেকে—

স্বরপুরে, মোর চাচাত ভাই আবদুল গনি, ঘটনার শুরুতে একদিন ওখেনের বাজারে বেমক্কা কয়েল— মুই পাকিস্তানি সাপোটার। তো তার দিন তিনেক পরে এক রাত্তিরি জনাদশেক মুক্তিসেনা আস্যে তারে ডাকল। মুই তহন স্বরপুরেই থাকি। হোডেল তহন নাই। সে কতা পএ কবো নে, ক্যান নাই। তো তারা আইস্যে গনিরে ঘর থনে উডোনে নামায়ল। কলো, মোগার বিচারে তোমার মিত্যুদণ্ড হইয়েছে। তুমি আজাকার, তুমি বাজারে খাড়ায়ি কয়েছ তুমি পাকিস্তানিগো সাপোটার। কী? কয়েছো কিনা? গনির তহন বাহ্য পেচ্ছাপ বাইর অইয়ে গেছে। তবো কোনোমতে সে কলো— মুই ব্যাপরডা বুঝতি পারিনি... ওকতা কলি যে দোষ অয়, মুই জানিনে। সে কল, মোরাতো গ্যাদাকালথে পাকিস্তান জিন্দাবাদ কয়ে আসতিছি। ভাইজান, গনি ছাওয়ালডা খারাপ ছিল না। বুঝ কম ছিল। কিন্তু সে কথা তেনারা শোনলেন না। কলেন— দ্যাশের শত্তুরেগো, বাইচে থাকার অধিকার নাই। বইলে, গুল্লি। গনি মরল। কিন্তু সে কোনোদিন কারুরই এট্টা চড়ও চোপারাও মারেনি— একথা তো মুই জানি।[৯]

একথা সত্য যে রাষ্ট্রবিপ্লবের মতো বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে কিছু নিরীহ বলিদানের ঘটনা ঘটে, যেমন গনির ঘটনা। বিপরীতক্রমে এটাও সত্য যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এসব কথা নিয়ে ভাবেনি কেউই। মানুষের এই সব ‘তুচ্ছ স্বার্থের কথা, বিরোধের কথা বৃহৎ রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় বেশিরভাগেরই চিন্তায় থাকে না। ফলে তারা এই সুযোগের নিষ্করুণ ব্যবহার করে সময়ে-অসময়ে। কথক যখন জানান শুধু ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল, এ-সব জায়গয় খবরই বেশি শুনতেন। পাশাপাশি কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ এসব জায়গার খবরও খুব লেখা হত কাগজে। কিন্তু যশোর, খুলনার কথা তেমন পাওয়া যেত না খবরে। তখন মোকছেদ জানায়—

ভাইজান, খুলনা যশোরও অনেক লহু, অনেক লাশ ভাইসেছে তার নদী খালির বুক দে। ঢাকা শহর মোগার রাজধানী। বড় বড় লেখনদার, কাগজওয়ালা, আর নেতারা সেহানে থাকেন। তানাদের খবর সারা জাহানের মানষি জানতি পারে। আর বাকি জায়গার মানষির খবর কজনা রাখে? যুইদ্দ যখন লাগল, তখন না আপনেরা আর সব জাগার খবরাখবর জানতি লাগলেন। কিন্তু সে খবরও কি সব আসল খবর? না, তার বারো আনা জাল। যদি কন— তুমি ক্যামনে জান? তো কই, মোরাও তো তখন ভারতের রেডিয়ো শুইনে ফাউকাতাম। সে খবরের সাথি ঝিকরগাছা, যশোর, ক্যান্টনমেন্ট কিংবা নাভারণের ঘটনার কিছু কিঞ্চিৎ মিল থাকতিও পরে, সঠিক কতি পারব না, তবি মোগার স্বরপুর, আশাশুনি ঝিনেদা বা এই যেখান দে আপননি আয়েলেন সেই রূপসা পারের কোনো ঘটনার কোনো মিলই পাতাম না। তখনই মোরা ভাবতে বসতাম, এ জাহানের কোনো মানষি কি কোনোদিন মোগার এই সব মানষিদের কতা জানতি পারবে না? রেডিয়োতে খালি শুনি যুইদ্দির খবর। কী? না, অমুক জায়গায় দশজন খানসেনা মুক্তিসেনার হাতে নিহত, আর দুই জন মুক্তিসেনা শাহাদাৎ বরণ কইরেছে। দশজোনে দুই জন? তালি তো যুইদ্দ খতম। এই রকম ভয়ংকর যুইদ্দ হলি কোন পাডা মুক্তিসেনার সাথে লড়ে?[১০]

খবর আর বাস্তবতার মধ্যে তফাৎ নজরে আসে বেশ। শুধু তো ‘যুইদ্দ’ নয়, এর সাথে প্রতি মুহূর্তে লাঞ্ছিত হয় মেয়েরা-মায়েরা। যুদ্ধের বাজারে মন ফুরফুরে রাখতে ‘মেলেটারিগো’ ছোটলোক বড়লোক বাড়ির মেয়েদের উঠিয়ে নেয় নির্বিচারে। কারো মুখে প্রতিবাদের ভাষা নেই তখন। কেননা, বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। আর ক্ষমতাই জন্ম দেয় দুর্নীতি বা ভ্রষ্টাচারের। তাই ভয়ার্ত সেই মানুষগুলি কেউই চায় না নিজের ‘হোগার মইধ্যে’ গুলি খেতে। তারপর সেই মেয়েরা বাঁচল কি মরল খোঁজ নেয় না কেউ। যে মেয়েরা জগৎকে আলোকিত করেছে তাদের এই অপমান মেনে নিতে পারে না মোকছেদরা। এই সব মেয়েদের বেদনা-লজ্জার ফসলকে নিয়েই হোটেল চালায় মোকছেদ। নিজের হোটেলে চোখের সামনে ঘটে যাওয়া এক ঘটনা কাহিনিকারকে শোনায় মোকছেদ—

সন্ধ্যাকালে চাইরজন মেলেটারি আর তিনজন আজাকার তিনডা মেইয়েরে কোনহান থে জানিনে উডায়ে লইয়ে আলো। দুইখান জিপ। কোনহান দে যেন আবার এট্টা খাসি খাসি বেশ বড়সড় সেডাও উডায়েই আনিছে মনে লয়। আইসে লামল মোর হোডেলির সামনায়। একজন রাজাকার খাসিডারে টানতে আন্যে কলো— এডারে কাইডে, ভাল কইরে বানাও। মোরা আইজ এহানে ফুর্তি করব। মোর যে রসুইকার হারুন মিঞারে দ্যাখলেন, সে তখন সবে এইয়েছে। সে কলো, রাইদে-বাইরে দিতি কন দেবোনে। তয় মোরা খাসি এহানে কাডি নে। আপনেরা কাইডে কুইডে দেন। আর এট্টা কতা, ফুর্তিটুর্তি যা করনের, অইন্য জাগায় করলি ভালো হয়। সে যে কথাগুলো কলো, তা খুব অন্যায় না। তবে রাজাকারেগো হাতে আছে অস্তর।

তারা কলো— মরতি চাও না বাঁচতি চাও? হারুন মিঞা আর কথা বাড়াল না। ভাইজান, সে রাত্তিরি মোর হোডেলি দোজখ্ নাইমে আয়েলো। ...বিকৃতির যতরকম নমুনা জানা যায় তার কোনোটাই তারা বাদ দেয়নি। একসময় অর্ধমৃত সেই মেয়েদের রাজাকারদের হাতে তুলে দিয়ে তারা বলেছিল— আভি তুমলোগ লে যাও, যো করনা হ্যায় কর লেও। লেকিন হিয়া নেহি। হামলোগ আভি আরাম করেগা।[১১]

মেয়েগুলোর বাঁচবার তীব্র আকুতি রাজাকারেরা শুনেছিল কিনা বলা যায় না, তবে তারা যে বিধ্বস্ত অবস্থাতেও আকুতি জানিয়েছিল সেকথা নিশ্চিত। মোকছেদ, হারুন মিঞারা বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে শত প্রতিকূলতা, হাজার দুঃখ-কষ্ট বুকে চেপেও। মারণাস্ত্র তাদের জন্য নয়। কেননা প্রেম-ভালোবাসার প্রতিপালন করা বুকে হত্যার প্রবেশ, আঘাতের প্রবেশ নিষিদ্ধ। লেখকের কথায়—

ভাগাভাগির এতকালের হুজ্জত পেরিয়েও, এখনও কিন্তু আমাদের আত্মিক সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়নি। শেষ হয়ে যে যায়নি, এখানে (অধুনা বাংলাদেশ) এলে বুঝতে পারি। এখানের বর্তমান প্রজন্ম কিন্তু তাদের বুকখানা কীর্তনখোলা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গার মতোই খুলে পেতে বসে আছে। তারা দ্বিজাতি তত্ত্ব জানে না, মুসলিম জাহান, হিন্দুরাষ্ট্র, পাকিস্তান-হিন্দুস্তান জানে না। তারা উৎসবে একত্রিত হয়ে আনন্দ করে। সে উৎসব ঈদ, মহরম কিংবা দুর্গাপূজা।[১২]

দেশভাগ, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, মুক্তিযুদ্ধ এইসব মানুষের মনের জোর ভেঙে দিয়েছে ঠিকই, তবে পারেনি পুরোপুরি মেরে ফেলতে। কেননা শিকড়ের টান প্রোথিত আছে যে গভীরে।

চার.

গভীরতারও একটা তল থাকে শেষপর্যন্ত। সেই অতল তলের তলানিতে লেগে থাকে শিকড়। আর তার টানেই মানুষের সঞ্চরণ, যেমন কথকের। দেশ ছেড়ে আসার পর থেকেই কথক কলকাতা নগরের বাসিন্দা। যুক্তি-তক্কোর আবহাওয়ার প্রভাব এসেছে মনে। সবকিছুকেই আবেগ দিয়ে গ্রহণ করার মানসিকতা আর নেই তাঁর। ফলে জীবন-নদীতে নাও ভাসিয়ে চলতে গিয়ে ঠোক্কর লাগে দুই পাড়ের অনুভূতিতে। লেখক তাকে বিচার করেন যুক্তির তুলাযন্ত্রে। অথচ কোন্ একটা অদৃশ্য শক্তি, 'কুবাতাস'প্রভাব বিছিয়ে রাখে মনজগতে। পরাজয় স্বীকার করতে হয় তাঁকে। তবে এটাই কি শিকড়ের ক্ষমতা? এটাই কি শিকড়ের গুণ? হয়তো তাই। না হলে কেন বারবার সিদ্ধিগঞ্জের টান, কীর্তিপাশার আকর্ষণ অনুভব করেন তিনি? নাগরিক জীবনের ব্যস্ততার মাঝেও নিশ্চয়ই দোলা দিয়ে যায় অদৃশ্য শিকড়ের আলগা বিক্ষেপের অনুরাগ। তাই ফকির-

সাবের কিংবা তাঁর বিবির মুর্শিদি গানে বা দেহতত্ত্বের গানে খুঁজে পান নিজেকে, ফেলে আসা শৈশবের স্মৃতিকে। ফকিরসাবের আস্তানায় রাতের খাওয়া-দাওয়ার পরে কথকের ঘুম আসে না চোখে। বলেশ্বর, কালীগঙ্গা নদীর জল-কলতান প্রবলভাবে আলোড়িত করে লেখকের মনজগতে সুপ্ত থাকা অবকাশকে। হোটেলঘরের মেঝেতে বসে ফকিরের বুকের ওপরে দোতারা দোতরং-এ জাগরী হয়, আর ফকিরের বিবি গেয়ে ওঠেন—

পাখি কখন জানি উড়ে যায়
বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়
পাখি কখন জানি উড়ে যায়।।
খাচা আড়া পড়ল বসে
পাখি আর দাঁড়াবে কীসে
এখন আমি ভাবি বসে
সদা চমক্-জরা ব’চ্ছে গায়।[১৩]

দেহতত্ত্বে এই পাখি প্রাণপাখি। এপাখির উড়ে যাওয়ার পরে পড়ে থাকে কেবল মূল্যহীন নশ্বর দেহ। কথকেরও কী কোথাও মনে হয়েছে, প্রাণপাখি উড়ে যাওয়ার আগে মাটির কাছে, জন্মভূমির কোলে গিয়ে একটু বসতে, একটু মাতৃভূমির আঁচল স্পর্শ পেতে? উত্তরে শুধু সম্মতি। না হলে, সারাদিনের ধকল পেরিয়েও কেন কথকের চোখে ঘুম নেই? কেন কালীগঙ্গার পাড়ে বসে মোকছেদ, ফকিরসাব আর তাঁর বিবির সাথে বসে নদীর জলতরঙ্গ শোনার ব্যগ্রতা? ফকিরসাবের তত্ত্বকথার মোহে আবিষ্ট কেনই বা তাঁর মন?

ফকিরসাব পাঠ দেন মনুষ্যত্বের। তিনি বলেন, লোকাচার, দেশাচার, ভাষা, কাজকর্ম আর জাতির ভিত্তিতে সমাজ। আর একটু বৃহত্তর অর্থে দেখলে ভারতবাসী, পাকিস্তানি কিংবা বাংলাদেশি। কিন্তু কেউ কখনো বলে না বা মানে না এই সকল জাতির ওপরে অবস্থান মানুষ জাতির। ক্ষমতাশালী বাহুবল দেখিয়ে অপরকে কব্জা করতে চায় এই দুনিয়াতে। ফকিরের চোখ মানুষ খোঁজে। তিনি বলেন—

মোগো আল্লা অইলেন মানুষ। মোগো সাঁইও মানুষ। তারও দ্যাহধম্ম আছে। ...মোরা কইলম মাইনষের মইদ্যেই সাঁইরে তালাশ করি, আর সাঁইয়ের মইদ্যেও মানুষ। আমাগো তত্ত্ব তলাশের গোড়ার কতাই অইলে মানুষ। মোরা— অংবং, অউম বুজি না, জাইত বুজি না, জন্ম বুজি না। অনচারী দুরাচারী বুজি না। মোরা খালি মানুষই বিচ্‌রাই। সমাজে যারগো চোর,

ডাহাইত, গুণ্ডা, বদমাইশ কয়— মোরা হ্যার গুনাহ লইয়া বাতচিত করি না। মোরা খালি হ্যার মইদ্যের মানুষটুক লইয়া এট্টু গাই। এয়ার বেশি, বাজান, মোগো ধারে আপনে কিছু পাইবেন না। হেই গান শুনইয়া যদি হ্যারা বদ কাম ছাড়ইয় দে তো উত্তম। আর যদি না ছাড়ে, মোরা খালি হ্যার মানুষটুকু লইয়াই লারমুচারমু। এ কতা কমু না— তুমি খারাপ, তোমার লগে আমার দুশমনি। না, হে কতা কওয়ার হক্ কোনো ফকিরের নাই।[১৪]

এই মানবতার কথাই তো শিকড়ের শিকরে শিকরে লেগে থাকে। আধুনিক জীবনে যতই অভ্যস্ত হয়ে যাক না মানুষ, এটাই তো তার প্রাণের কথা। আর একথাই ভুলে যায় সে বারবার। তখনই শুরু হয় ডিস্‌টোপিয়ান সংঘর্ষের। ধর্ম, ভাষা, দেশ, বাওন, মোল্লা, শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, আনসারি, নিকিরি, সুফি, ফকির, সব কিছুই তো একটা শিকড়ের ভিন্ন ভিন্ন টুকরো। আম গাছের ডাল কেটে যে নতুন আম গাছ প্রস্তুত করা হয় তাতে আমের বকুলই আসে প্রতি বারে, অন্য কোনো ফলের বকুল নয়। অথচ মানুষ তার শিকড় কেটে বেরিয়েই ভুলে গেছে তার অতীত ঐতিহ্যের কথা, তার প্রধান শিকড়ের গুণাগুণ। এখানেই মানবতার মৃত্যু। ফকিরসাব পাঞ্জ শাহের আক্ষেপ গান করেন—

ফকিরি করবি খ্যাপা কোন রাগে?
আছে হিন্দু মুছলমান দুই ভাগে
থাকে ভেস্তের আশায় মোমিনগণ
হিন্দুরা দেয় স্বর্গেতে মন
ভেস্ত স্বর্গ ফাটক সমান
কার বা তা ভাল লাগে?[১৫]

পরকালের হিসেব কষতে কষতে ইহকালের সময়টা যে মাটি হয়ে গেল সেকথার হিসেব রাখে না ধর্মভীরু হিন্দু কিংবা মুসলমান। সবাই নিজের নিজের অস্তিত্বের প্রচারে মশগুল। মানুষ আর ধর্মের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য হল, ধর্ম ছাড়াও মানুষের সত্ত্বা বা এন্টিটি সম্ভব কিন্তু মানুষ বিনা ধর্মের কোনো অবয়ব বিনির্মাণ করা অসম্ভব। তা, এই দ্বন্দ্ব বানায় কারা? ফকিরসাব বলেন স্বর্গ আর বেহস্তের যারা যতই ভেদাভেদ করুন না কেন, গন্তব্য সবার এক, সবাইকে যেতে হবে একটা জায়গাতেই। আসলে স্বর্গ, বেহেস্ত শব্দগুলি যেন একাধিক দরজাওয়ালা এক কক্ষের দরজাগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম। আবার অন্যদিকে প্রখর বাস্তববাদীরা এই ‘অতিসূক্ষ্ম’ মানবতাবাদের চৌকাঠ

পেরোয় না বা পেরোতে চায় না নিজেদের স্বার্থাংশ ছেড়ে। কেননা, অদৃশ্য শিকড়ের আলগা বিক্ষেপের অনুরাগের কাছে ভয়ের কুহক লুকিয়ে থাকে নিজের জমি হারিয়ে ফেলার, সময়ের উদ্দাম স্রোতের কাছে পরাজিত হয়ে যাওয়ার কিংবা ভেঙে পড়ার যত্নে লালিত নকল কিংখাবের।

পাঁচ.

দেশভাগের উদ্দাম স্রোত বেপরোয়া হয়ে যাদের ঘর কেড়ে নিয়েছে তারা অসহায়। দাঙ্গায় নিজের বাস্তুজমি হারিয়ে ফেলেছে যারা, তারা অন্ন-ছায়ার চিন্তায় দিশাহারা। মুক্তিযুদ্ধের আঘাতে স্বজন হারিয়েছে যারা, পঙ্গু দশায় একটু আলোর সন্ধান করছে তারা। নিজেদের জীবন, অস্তিত্ব বাঁচানোর তাগিদে তারা আশ্রয় করে আছে খড়কুটো। আর ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে থাকা মানুষগুলিই হল 'সংখ্যালঘু'। শব্দটার দিকে একটু তাকালে আমরা দেখতে পাব, সংখ্যায় যারা কম তারাই সংখ্যালঘু। এখন প্রশ্ন এই 'সংখ্যা' কীসের ওপর ভিত্তি করে? জাতিভিত্তিক বা ধর্মভিত্তিক গণনার ওপর, অভিবাসনের ওপর, কর্মের ওপর সর্বোপরি সমাজবিন্যাসের ওপর।

একটা গল্পের মাধ্যমে বিষয়টিকে হালকা করার চেষ্টা করছি। ধরা যাক, একটি হিন্দু গ্রামে একশো পরিবারের বাস। এরমধ্যে কুড়িটি পরিবার ব্রাহ্মণ, তিরিশটি পরিবার উচ্চবর্ণ ক্ষত্রিয়, কুড়িটি পরিবার উচ্চকোটির বণিক, দশটি পরিবার সম্পন্ন কৃষক, বাকি কুড়িটি পরিবার কামার, কুমোর, তাঁতি, গোয়ালা, নাপিত, রজক, হালুইকর, ডোম, চর্মকার, ঝাড়ুদার, মেথর সম্প্রদায়ের মানুষ ও কয়েকটি পরিবার না-হিন্দু। সামাজিক অবস্থানের নিরিখে শেষোক্ত পরিবারগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। গ্রামটি হিন্দু না হয়ে মুসলমান হলেও তাদের সামাজিক অবস্থানের কোনো পরিবর্তন নেই। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে বহুল পঠিত সলিল সেনের নতুন ইহুদি নাটকের কথা। সেখানে আমরা

দেখতে পাই ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় চলে এসেছে মনোমোহনের পরিবার। ওপার বাংলায় যে সামাজিক প্রতিপত্তি তাঁর ছিল, এখানে বিন্দুমাত্র নেই। শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে কয়েকটি অভিবাসী পরিবারের সাথে বস্তির মধ্যে আলো-হাওয়া বিহীন ঘরে কোনো রকমে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা তাঁর। হিন্দুস্তানে এসে বর্ণহিন্দুদের দলে তাঁর কোনো জায়গা হয়নি, অথচ তিনিও হিন্দু। একটু 'ভালো ভাবে'বেঁচে থাকার প্রবল প্রত্যাশায় তাঁর এখানে চলে আসা। আর এখানে এসে তিনি স্বধর্মের মানুষের কাছেই সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন, অন্ধকার হয়ে গেছে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ। সে কাহিনি

আমরা জানি। অমিয়ভূষণ মজুমদারের নির্বাস উপন্যাসের হলুদমোহন ক্যাম্পের কথাও নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে। বাস্তু থেকে উৎখাত হয়ে কীভাবে তাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম-এ আমরা দেখতে পাই এই সংখ্যালঘুর সংকট। পাকিস্তানি খান সেনা বা রাজাকারেরা ধর্মীয়ভাবে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের রেয়াত করেনি। অর্থাৎ এখানে সামাজিক সংখ্যালঘুতা কাজ করেনি, ক্রিয়াশীল হয়েছে ভাষাগত সংখ্যালঘুর সংকট। সমস্ত বাঙালিকে হত্যালিপ্সায় মেতে ওঠে তারা। এই রক্তযজ্ঞের বলি অপবর্গী বাঙালি সম্পর্কে ছোমেদ বলে—

যেন আর পাঁচটা দুর্যোগের মতোই, খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতোই, এই মুক্তিযুদ্ধও একটা-বা। ওতেও তারা মরে, এতেও। নচেৎ মরার লোকের তো বড় অভাব। বাবুরা ভদ্দরলোকেরা তো কদাচিৎ মরে। তবে যখন মরে, তখন বড় শোরগোল হয়, সবাই বুঝতে পারে— কেউ একটা মরেছে। অপবর্গীদের মৃত্যু অহরহ, তাই তার একটা খবরও হয় না।[১৬]

ছোমেদের এই কথার সূত্র ধরেই কথকের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। তিনি ভাবতে থাকেন—

...সেই সময় যখন কোনো শ্রেণী তার শ্রেণীতে আবদ্ধ নয়। কোনো জাত তার জাতে। তখন বাংলাদেশে মুক্তি আন্দোলন চলছে। অন্তত পত্রকারদের কথনে, রাষ্ট্রনায়কদের ভাষণে, আমরা তাই জেনেছি। তবে সেখানে আমরা এই অপবর্গী মানুষদের মৃতদেহের হিসেব ছাড়া আর কিছুই পাইনি। তখন শুনেছিলাম, এই মুক্তিযজ্ঞে নাকি সব শ্রেণীর লোক ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই অপবর্গী (ছোমেদের) কথকতায় সে রকম কোনো চিত্র তো পাচ্ছি না, ভুক্তভোগী তারা অবশ্য হয়েছিল। প্রাণ দেওয়া-নেওয়া বিষয়ে একটা কথাই বলা যায়, অজ্ঞানের বলি আর সজ্ঞানের প্রতিহিংসা। তাকে কোনোভাবেই বিপ্লব
বা মুক্তিযুদ্ধ বলা যায় কিনা জানি না।[১৭]

আমরা এই প্রতর্কে যেতে চাই না, শুধু এটুকুই বলতে চাই খবরে বা রাজনৈতিক নেতার ভাষণে যাই ভেসে আসুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে ছোমেদরাই ভেসে গিয়েছিল সাগরের অথৈ জলে। তাদেরকেই হারাতে হয়েছিল সব কিছু। আত্মীয়, পরিবার, পরিজন খুইয়েছিল তারাই। তাই এখন প্রতিপদে সাবধানতা শুনিয়ে যায় সে—

...যেবা আছো হিন্দু আর যেবা মুসলমান সগলায়ই ছোমেদ আলির কলিজার সমান। মারামারি কাডাকাডি ভাইগণ, আমরা অনেক করেছি, আর থাউক। য্যার য্যার ধম্ম করতে ইচ্ছা অয় কর, মানা করি না। তয় ধম্মের নামে আর জবাই কর্ইও না। মেলেটারির গুতায় যদি ছোমেদ বয়াতির এট্টুও আক্কেল খুলইয়া থাহে, তয়, হেডা অইলে এই এই যে, য্যার হাতে যহন খ্যামতা, হে তহন নানান অছিলা করইয়া মোগো মারবে। হিন্দু, মোছলমান বলইয়া কোনো রেয়াত করবে না। খালি যে মারবে হেয়া না, মোগো হাতায় এ পাপ করাইবেও। লঙ্কায় যে যায় হেই অয় রাবন।[১৮]

তাই আরও বেঁধে বেঁধে থাকার আমন্ত্রণ সবাইকে। সেই ছবিও দেখতে পাই এই আলেখ্যর পরতে পরতে। গ্রাম সুবাদে রসিকের জামাই মুজিবর পূজার সকল জোগাড় দেয়, তাই সে মণ্ডবী। রায়বাড়ির বলির পাঁঠার মাংস বিনা পিঁয়াজে কেবল হিং দিয়ে সুন্দরভাবে রান্না করতে দেখা যায় রসিকের চাচাত ভাই খলিলকে। রান্নার জন্য এই পরিবারে সে 'খলিল ঠাহুর' নামেই সমাধিক পরিচিত। আলকাতরার দোকানে কাজ করতে করতে রসিকের বাবা কুদরৎ মারা গেলে, একদিন রায়বাড়ির বড় কর্তা দুগ্ধপোষ্য রসিককে এইবাড়িতে এনেছিলেন, রায়গিন্নির আপত্তি ছিল রসিক যাতে পূজার ঘরে না যায়। আর একদিন সেই রসিক রায়বাড়ির এক শিশুকে নিশ্চিত সাপের ছোবল থেকে উদ্ধার করে ঠাকুর ঘরে ঢুকেই। তারপর থেকে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে সব। খলিলের বিবাহের পর গোঁড়া মুসলমান শ্বশুরবাড়ি হিন্দু বাড়ির সাথে মেলামেশা মেনে নেয়নি, অশান্তি হয়েছে। শেষে বউ রেগে বাপের বাড়ি চলে গেলে আর আনতে যায়নি খলিল। ছোমেদ নিকিরি অর্থাৎ মাছ ধরা তার চৌদ্দ পুরুষের পেশা, কিন্তু এখন সে ছোমেদ বয়াতি। কথার বয়ানই যার বেঁচে থাকার রসদ। নিঃসন্তান কার্তিক আর তার স্ত্রী অবলীলায় পালন করে চলেছে দৌলত আর সরস্বতীর পুত্রকে, নাম রেখেছে কানাই। সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে মারা যাওয়ার পরে সরস্বতী তার সন্তানকে দিয়ে দেয় কার্তিক দম্পতিকে। ছোমেদ বয়াতি ঠাকুর দেবতাকে নিয়ে গান গায়, মানুষকে নিয়ে। হিন্দুদের পৌত্তলিকতায় তার আপত্তি নেই। সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না, নিয়মিত রোজা রাখে না। নিজেরদের জাতিভেদ আর রোজা প্রসঙ্গে আক্ষেপের সঙ্গে সে বলে—

মোছলমানেগো মইদ্যেও কইলম জাইত আছে। আশরাফ, আতরাফ আছে। হ্যারগোও চাইর জাইত— শ্যাখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান। হিন্দুগো যেমন। এই চাইর জাইতের খেলা কইলম শ্যাহেগোও আছে। মোরা অইলাম আনছার, জোলা, নিকিরি। মোরা জাইতের বাইরে। শ্যাখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠানের লগে মোগো বিয়াসাদি অয় না। হ্যারা পুতুল পূজা, বুতপরস্তির

মইদ্যে নাই। হ্যারা পাচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। জাকাত, খয়রাত মানে, কব্বর মাজারে দোয়া দরুদ পাঠ করে। মোরা নি কিছু করি? তয় মুই ক্যামনে মোমেন মোছলমান ওই। মুই তো পাচ ওয়াক্ত দূরঅস্ত, রোজ কয় ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, নিজেই জানি না। রোজাডা অবশ্যই রাহি। তয় হেয়া হারা বচ্ছর। খালি রমজান মাসে না। যদি জিগাও ক্যামনে? তো কই। রোজা রাখমুনা, খামু কী? ধান, মান, কলা, কচু জমিতে যেডুক অয়, হেয়া তো পাচ ছ মাসের খোরাইক। হ্যার পর তো রোজাই রোজা। ...য্যাগো নিত্য অভাব, খাওন জোডেনা, হ্যারগো রোজা রাহন সাইদ্যের ফরজ। অইন্য সোমায়, জোডলে খাইলা না, না জোডলে হুতাশ। রোজার মাসে কোনো হুতাশ নাই। তহন হেডা নিয়ম। তহন উপাস করলেই ছওয়াব। তয় হেনায় যে ক্যান রাত্তিরে খাওনডাও বন্দো করলেন না, হেডা বুঝি না। হেডা যদি করতেন, তয় আর কোনো উদ্বাগ থাকতে না।[১৯]

নেহাত কথার কথা হলেও, নিজের দেশে নিজেই সংখ্যালঘু হয়ে থাকার বেদনা ধরা পড়েছে ছোমেদ বয়াতির গলায়। অদ্ভুতভাবে এই সমস্ত সংখ্যালঘুর ধর্ম আলাদা আলাদা হলেও জাতি একই, পেশা একই। ধর্মের ভিত্তিতে নামগুলো পাল্টে গেছে কেবল। তার গানে ধরা পড়ে সে কথা—

...কেবা মালাউন কেবা কাফের, ব্যাক হিন্দু কি একোই মাপের
বেয়াকেই কি শ্যাহের লগে একই ব্যাভার হরে?
যারা আছে উপাস দিয়া, হ্যারগো মোরা মারমু কিয়া
হ্যারা মোরা এ্যাকোই লগে খাডিপিডি ভুগি।
কেউবা আছেন নমোশূদ্র, জাতে তারা অতি ক্ষুদ্র,
আরও আছে কামার, কুমার, নাপিত, তেলি, যুগি।
হ্যারগো মোরা মারমু ক্যালায়
কী আছে ভেদ তাতি জোলায়
পরামাণিক আর হাজামে, কী আছে অন্তর?
এ্যাকোই কামের মানুষ মোরা, রুজি রোজগার দুনইয়া ছাড়া
তমো মোরা জাইতে পাইতে থাহি স্বতন্তর।[২০]

নিজের দেশ, নিজের মাটি, নিজের জমি অথচ কতিপয় মানুষ তাদের স্বার্থসিদ্ধির আড়ালে সমাজে মূল স্রোতের ধারক-বাহক-কারিগরদের সরিয়ে রেখেছে দূরে। তা বলে তো বেঁচে থাকা আটকে যায় না। তারা বেঁচে থাকে পরস্পর পরস্পরের সহায়তায়। তাদের দেবতা-আল্লায় কোনো প্রভেদ নেই, তারা নিজেদের কষ্টের কথা জানাতে গিয়ে

দেবতাকে খেউড় করে, আল্লাকে খিস্তি করে। আবার একজনা অপরজনার আরাধ্যের কাছে অনুযোগও করে। তাদের চিৎকারে সাথে মিশে থাকে বাস্তব রূঢ়তা আবেগ, বেদনা। তারা জানে নিজেদের রক্ষা করতে হয় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। সাহায্যের হাত বাড়ানোর সময় তারা দ্যাখে না সাহায্যের অপেক্ষায় থাকা মানুষটি কোন ধর্মের। তারা বিশ্বাস করে মানবতায়, তারা বিশ্বাস করে মাটির টানে। রায়বাড়ির দুর্গাপূজায় ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বৃষ্টিতে সব কিছু লণ্ডভণ্ড হওয়ার যোগাড় তখন সুধীর গাইন বাজারের হরিসভায় টিন চাইতে উপস্থিত হয়। হরিসভায় কীর্তন গাওয়ার জন্য তার ডাক পড়ে, এমনকি দশজনে তাকে মানেও। তাই সাহায্য-প্রাপ্তির প্রবল বিশ্বাস নিয়েই সে হাজির হয় হরিসভার মান্যবর্গের কাছে। আর কিনা তাকেই টিন না নিয়ে খালি হাতেই ফিরতে হয়। সে ঘটনা না হয় তার মুখ থেকেই শোনা যাক—

> ...(হরিসভার লোকজন) বলে, ওহানে টিন দেওন যাইবে না। ওহানে শ্যাখ, হিন্দু বেয়াকে একলগে খাওনদাওন করে, নাচে কোদে, ওরা মোরা ভালো ঠেহি না। আপাদমস্তক জবেজবে ভিজে সুধীর অপমানে ফুলতে ফুলতে এসে বলে, হরিসভার টিনে মুই মুতি। আবার ডাহুক কোনোদিন মোরে কেত্তন গাইতে, হোগা দিয়ো গাইয়া আমু হ্যানে।[২১]

হরিসভায় সুধীর গায়েন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে, সেই রাতেই কীর্তিপাশার ‘জামাই মেম্বার’ মীরাকাডি মসজিদ থেকে টিন আনতে পাঠিয়ে দেয় ‘রুস্তম মোল্লার পোলা’ ছবুর ও তার সঙ্গীসাথীদের। রায়বাড়ির কাকিমার টিনের উৎস সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব চান্দ্রদ্বীপী সংলাপে বলে ছবুর—

> কিত্তিপাশার বাজারে বইয়া জামাই মেম্বাবের কইলে, ছবুর তুই মীরাকাডি যা। মীরাকাডি মসজিদে টিন আছে, মোর কতা কইয়া যাইয়া লইয়ায়। হরিসভার মাতব্বরেরা টিন দেলে না। হে লাংচুনির পোয়েরা বইয়া খালি বন্দেজ করে। মুই নাওহান লইয়া গেলাম, টিন উডাইলাম, আর আইলাম। দূর তো কোম না, এট্টু দেরি অইয়া গেছে।[২২]

আর তারপরে ছবুর আর সঙ্গীসাথীদের লুঙ্গি বা গামছা দেন কাকিমা, ওদের শরীর ভিজে গেছে যে...! ‘অর হ্যানে জ্বর’ হতেও তো পারে...! ‘অতঃপর একটি বৃহৎ পাত্রে ভাত, অপর দুই পাত্রে মাংস এবং ডাল নিয়ে কাকিমার বারান্দায় আগমন।’ উদ্দেশ্য বুঝতে আমাদের বাকি থাকে না আর।

সপ্তমীর সকালে কার্তিক এসে মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা জানায়, অভিযোগ করে বিপদের সময় পাশে না থাকার জন্য। একজন দেবীর এমনটা করা উচিৎ বলে মনে করে না

কার্তিক। বাঙালি হিন্দুর সাথে দেব-দেবীর সম্পর্ক বাৎসল্য রসের উৎসারী একথা সবার জানা। কার্তিকও জানে। তাই সে দুর্গাকে মনে করে বাড়ির কেউ, পরিবারের কেউ। তাই তার বেদনাসম্ভূত প্রশ্ন সহজভাবেই বেরিয়ে আসে এভাবে—

> হে মা ভগবতী, তুমি দশভূজা, অসুরনিপাতিনী, শত্রুদলনকারিণী, ভক্তবৎসলা, অগতির গতি, অবলের বল। তোমার কৃপায় দুষ্টের দমন হয়, শিষ্টের পালন হয়। তুমি শক্তিস্বরূপা, আদ্যাশক্তি মহামায়া। এইরহম পুরোহিত গোঁসাইরা কয়। শাস্তরে নাহি এরহমই ল্যাহা আছে। এইসব কতা ছোডোকাল থিয়া হুইন্যা আহিতাছি, মাগো, এমনও হুনি, তুমি বিপদতারিণী, আপোদনাশিনী, আরও কত কী! মুই আপড়া, আলেহা, যেয়া হুনছি, হেয়া কইলাম। কিন্তু মাগো, তোমারে এট্টা কথা জিগাই, যহন মিলিটারিরা আইয়া, হেই মুক্তিযুইদ্দের সোমায়, মোগো হোগার ফুডায় বন্দুকের নল ঢুকাইয়া চিরইয়া ফারইয়া শ্যাষ করতে আছেলে, তহন তুমি কোতায় আছেলা, চুৎমারানি? এহন যহন বেয়াক কিছু ঠাণ্ডা, তহন আবার গুষ্টি সুদ্দা, রাউয়ার মতো পূজা খাইতে আইছ? হত্য কমু মাগো, দোষ অফরাদ নিও না, তোমার মতন এমন বেহালাজ মাইয়া মানুষ, আর এট্টাও দেহি নাই।[২৩]

সামাজিক দলন-পীড়নে ক্লান্ত ছোমেদ বয়াতির কণ্ঠেও ধরা পড়ে একই সুর। শুধু ধর্মের পোশাক পাল্টে যায়, মানুষগুলির অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। সে কথা বলে ছোমেদ—

ঝড় আহে পানি আহে
আহে বইন্যা খরা।
ডোয়ায় পাশে কিলবিলায় সাপ
ঘরে বাসা মড়া।
মাতার উপার খ্যারের ছাউনি
পেত্থম গোত্তায় যায়।
চৌহির নীচে গরিব গুর্বা
খামার দিই আল্লায়।
আল্লামাবুদ নিব্বইংশার পুত
আল্লা খানকির ছাও
তোমার কেরপায় হ্যারা খায় গোস
মোরা খুদের জাউ।[২৪]

ছোমেদের কাছে শ্রোতাদের অনুরোধ জগজ্জননী মা একবার আসেন বছরে তাকে নিয়ে

একটা গান না শোনালে তাঁর ‘কোদ’ (ক্রোধ) হতে পারে। ছোমেদ জানিয়ে দেয়, ইসলামে এটাকে বলে বুতপরস্তি, পুতুলপূজা। কোরান শরীফে বলা হয়েছে ‘এ্যারা (দেবতারা) না পারে নিজের ভাল করতে, না অইন্যের’। কিন্তু ছোমেদ বয়াতি, সে মনে করে আল্লা তাকে ‘বেয়াক কিছুর উফার দখলদারি’ দিয়েছেন। তাই যে কোনো বিষয় নিয়ে গান করার অধিকার তার রয়েছে। এতে তার ‘গুনাহ্’ হয় না। সে ‘মোছোলমানের পো’ কিন্তু সে নির্দ্বিধায় হিন্দুদের গান করতে পারে। সে গান শুরু করে দুর্গাকে নিয়ে, গণেশ-কার্তিক-লক্ষ্মী-সরস্বতীকে নিয়ে। ছোমেদ গানের মধ্যে দিয়ে অনুযোগ করে বলে, লক্ষ্মীর প্রতিমা তার ওপর ‘এট্টু সাত্থপর’, তার চাই ‘এট্টু ধানি জমি। সরস্বতীর গুণের বর্ণনা দিয়ে সে জানায়, ‘হাচা কতা কইলে মোল্লা মৌলারা’ একটু বিগড়ে যায়। আর গান শেষের সময় তার গলায় ধরা পড়ে আকুতি। সে আকুতি তার একার নয়, সে আকুতি আসরে উপস্থিত হিন্দু মুসলিম ব্যাতিরেকে তামাম বাঙালির, যারা সে অঞ্চলের শিকড়ের মতো, যাদের গায়ের ঘ্রাণের মেঠো সুবাস ভেসে আসে ঝিরঝির করে। ছোমেদের আকুতি ছিল এমন—

...ছোমেদ মেঞার বড় দুক
নিত্য হ্যার প্যাডে ভুক
হে ভুক মিডাইতে তার নেই কোনোও উপায়।
ভুকের কতা কইতে আইয়া
জারি গান গাইতে বইয়া
ছোমেদ মেঞার বেয়াক কিছু
আউল ঝাউল অইয়া যায়।...
যদি জোডে জমিডুক
ছোমেদ মেঞার মেডে ভুক...[২৫]

এখানে ছোমেদ একা না, অনেক ছোমেদের প্রশ্ন মিলেমিশে এক হয়ে আছে। মিশে যেতে পেরেছে কারণ তারা সংখ্যালঘু। হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের কথা একটি সমালোচনায় বলেছেন সমালোচক—

খেয়াল রাখা দরকার, মিহিরের এই স্বভূমি-পরিক্রমার সময়টা ১৯৮৬ সাল। বাংলাদেশ নিয়ে এপার বাংলার আবেগ ততদিনে স্তিমিত। ওপারে শেখ মুজিব নিহত। এরশাদের মিলিটারি জমানা তখনও শেষ হয়নি। মৌলবাদীদের বাড়বাড়ন্ত চলছে। বাংলা ভাষা নিয়ে ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের ভালোবাসার আবেগ শহরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। যে-

গ্রামে মিহির ঠাঁই নিয়েছেন, বাংলাদেশের বাকি সব প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মতোই সেখানকার সমাজ-সংস্কৃতিতে একটা পরিবর্তন এসেছে। অবস্থাপন্ন বর্ণহিন্দুরা বেশির ভাগই দেশত্যাগ করেছেন। নিরুপায় যারা থেকে গেছেন, তাদের অতীতের রক্ষণশীলতা এবং ছুঁৎমার্গ দেশকালের চাপে প্রায় অন্তর্হিত; হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নিম্নবর্গীয় মানুষদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক অভিন্নতা তার মধ্যে পুরোপুরি সামিল হয়ে গেছেন তাঁরা। অতীতেও তাদের সাংস্কৃতিক উৎসবে তাঁরা অংশ নিতেন ঠিকই, কিন্তু একটা অদৃশ্য বেড়া ছিল যেটা বর্তমানে ভেঙে পড়েছে। মৌলবাদীদের প্ররোচনা সত্ত্বেও তাই গ্রামাঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়নি।[২৬]

বাংলাদেশে ধর্মীয় কারণে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সাথে আর্থ-সামাজিকভাবে সংখ্যালঘু মুসলমানেরা অনায়াসে মিশে যেতে পেরেছে। কিন্তু প্রশ্ন হয়, যদি এভাবেই সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চলে তাহলে ভবিষ্যৎ কেমন হবে? সমালোচকের কথায়—

কিন্তু তাহলে কী বাংলাদেশ শেষপর্যন্ত সংখ্যালঘুশূন্য দেশে পরিণত হবে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন বর্তমানে যে ধারা চলছে এই ধারা চলতে থাকলে ২০৫০'র ভিতর সেই প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। তখন বিদেশী নাগরিক ছাড়া কোনও ভিন্নধর্মের মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে দেশের নাগরিক হিসেবে থাকবেন শুধু মুসলমানরা। হয়তো তাই হবে। এর জন্য শুধু কষ্ট পাবেন বাংলাদেশের মুক্তমনের বুদ্ধিজীবী আর সুশীল সমাজ। অসাম্প্রদায়িকতার প্রচারে কিছু পত্র-পত্রিকা, তাছাড়াও সাংস্কৃতিক নাট্য ও কলা সংগঠন, হাতে গোনা কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যারা দিনের পর দিন অবিশ্রান্তভাবে প্রচার করে গেছে অসাম্প্রদায়িকতা নানাভাবে নানারূপে, পৃথিবীর অন্য কোনও মুসলিম দেশে এঁদের মতো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন নেই। তাঁরা চেষ্টা করেছেন, করে যাচ্ছেন বাংলাদেশে একটা অসাম্প্রদায়িক আলোকিত নতুন প্রজন্ম তৈরী করতে। কিন্তু হেরে যাচ্ছেন রাজনীতি নামে দানবের কাছে। যখন সেই দানবের বিনাশ ঘটবে ততদিনে বড় দেরী হয়ে যাবে বলে মনে হয়। কারণ তার আগেই যে বাংলাদেশ থেকে চলে যেতে হবে সব ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের। তাদের কথা বাংলাদেশের ইতিহাসে কীভাবে লেখা থাকবে তা কেউ বলতে পারে না।[২৭]

মিলে মিশে থাকার জন্য চাই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব। এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে কত দিন? ততদিন পর্যন্ত কি টিকে থাকতে পারবেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা? আদৌ কি সমাজ মিলিয়ে নেবে সবাইকে? নাকি সময়ের সাথে সাথে ধুলোয় মিশে যাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর দল? বাংলাদেশের এই সাংবাদিকের কথায়—

বাঙালি মুসলিম মানস আবার ধ্যান করছে অতীত। স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে

মরুভূমির। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তারা বিরক্ত। জাতিকে বিভক্ত করার তথাকথিত অপরাধ প্রতিরোধে মুক্তিযোদ্ধা-রাজাকারের সহাবস্থান এখন যৌক্তিক। মর্দে মোমিনরা যে স্বপ্ন দেখেছিল তা এখন ফলবতী হতে যাচ্ছে। জামাতিরা এবং জামাতঘেঁসা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতিকরা এবং রাজনৈতিক সমীকরণের কারণে ভীরু আওয়ামী লীগ যে বিশ্ব মুসলিম ঐক্য, মুসলিম উম্মাহর কথা তারস্বরে বলে যাচ্ছে, যাদের জ্ঞাতিত্বের স্বপ্ন বাঙালি মুসলমানদের চেতনাকে দেউলে করেছে, সেই তুর্ক-মুঘল শাসক গোষ্ঠী কখনো তাদেরকে আপনজন ভাবেনি। অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যই করেছে চিরকাল। তারা ছিল ঐশ্বর্যের উল্লাসে, প্রতাপ ও প্রভাবের দাপটে, আভিজাত্যের গর্বে, উপভোগের আনন্দে ও প্রতিপত্তির গৌরবে আকাশচারী। বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক কোনো সামাজিক সম্পর্কও ছিল না।[২৮]

সম্পর্ক হয়তো আবার স্থাপিত হবে, মানুষ আবার মিশে যাবে মানুষের সাথে। সমাজে আবার অধিকার ফিরে পাবে সংখ্যালঘুরা— এই বিশ্বাসই এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের।

ছয়.

শিকড়ের সাথে শিকড়ের মিল হয়ে গেলেই আর আক্ষেপ থাকে না মানুষের। তখন সে থিতু হতে চায়। আর তা না হলে দেখা যায় উৎসের দিকে তার যাত্রা। যাত্রাপথ যতদীর্ঘই হোক না কেন। দৌলত, অষ্টচরণ দাস, ছোমেদ মৎসশিকারের উদ্দেশ্যে সাগরের পথে যাত্রা করলে তারা দেখতে পায় উজানিয়া কাঁকড়ার দল। লেখক এদের সম্পর্কে বলেছেন—

...এই কাঁকড়া যেন প্রায় নিয়তনির্দিষ্ট মরণও নিয়ে আসে প্রত্যন্তবঙ্গের এইসব মানুষদের জীবনে। অসাধারণ স্বাদ। যখন তারা উজান পথে নেমে আসে, তাদের কোনো সীমা সংখ্যা থাকে না। বিলের বদ্ধ জলে জন্ম নেয় এরা। শরতের শেষে, সোঁতার টানে নেমে আসে তারা। অদ্ভুত তাদের চরিত্র। তারা স্রোতের বেগে নামে, কিন্তু গতি রাখে তার বিরুদ্ধে। যেন মাতৃজঠর তারা ছাড়বে না কোনোমতেই। এ কারণে নাম উজানিয়া, যেন বাঙালি।[২৯]

অসাধারণ স্বাদ শুধু কাঁকড়ার নয়, এ স্বাদ উজানযাত্রারও। তাই এই যাত্রা করেছেন লেখক মিহির সেনগুপ্তও।

শহরের বিবর্ণ জীবনযাত্রার একঘেয়েমিতা থেকে রিলিফ পেতেই তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে নিজের শিকড়ের দিকে। মানবিক হৃদয়বৃত্তির অমোঘ আকর্ষণকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি কোনোভাবেই। নগরজীবনে তিনি একজন মার্জিত রুচির নাগরিক ঠিকই, কিন্তু সেই নগরের কোলাহলে নিজের আত্মাকে খুঁজে পান না। অথচ

প্রত্যন্ত বাংলার নদীপাড়ের এক অশিক্ষিত শ্লীলাশ্লীলবোধশূন্য এক কথার কারিগর ছোমেদের সাথে নিজের আত্মাকে খুঁজে পান, দেখতে পান ফেলে আসা মাতৃভূমির আদরের হাতছানি। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে তুচ্ছ করে ছোমদেকেই তাঁর মনে হয় শেকড়ের নির্যাস, তাঁর আত্মীয়, তাঁর বাবা। ‘পরবাসী, নির্বাসিত দেশবিভাজনে নিক্ষিপ্ত’ মিহির সেনগুপ্তের সাথে কচা নদীর ভালোবাসা বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

কচার দু-পাশে, বিস্তৃতি হেতু, নিকট নয়, তথাচ দৃশ্যমান বৃক্ষেরা আবাল্য পরিচিত, তাই ভালবাসার সামগ্রী। অসম্ভব সব স্বপ্ন তাদের পাতায় মাখানো রয়েছে। শিশিরের সাথে তা টুপটুপ করে খসে পড়ছে। সেইসব গাছেরা ফিসফিস করে এখন আমায় ডেকে বলছে— কেডা যাও? নাওহান লাগাও মোর শেহড়ে। দুদণ্ড জিরাইয়া যাও। নদী এইসব স্বপ্নসম্ভব কথা পৌঁছে দেয় আমার কানে।
দশে ধম্মে বলে, এত আবেগ ভালো না। তা ভালো মন্দ নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমরা চন্দ্রদ্বীপজ বাঙাল। আমাদের নৈসর্গিক পরিবেশ, বিশাল বিস্তার, দিঘি, নদী, খাল, পুকুর, ধানক্ষেত আমাদের যেমনটি করে তৈরি করেছে, আমরা তেমনটি হয়েছি। তারা আমাদের রক্তমাংস—হাড়মজ্জায় এই সব ঢুকিয়ে দিয়েছে। দু দিনের নাগরিকতার তোড়ে আমাদের এই আহ্লাদের আবেগটুকু ভাসিয়ে দিতে পারি না।[৩০]

লেখকের যাত্রাপথ চেনা। যারাপথের প্রতিটি দৃশ্য চেনা। আর চেনা যাত্রাপথের যাত্রীরা। এমন মনে হয় কখন? নাড়ির টানে, নীড়ের টানে যখন পথ ভোলা পাখি ঘরে ফেরার গান গায় মনের অন্তঃস্থল থেকে। যে পথ মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার হাতছানি দেয়, সে পথ সব সময়ের জন্য চেনা। ‘চন্দ্রদ্বীপী বাঙাল’ মিহির সেনগুপ্তের কাছেও এই একান্ত অনুভূতি পাখা মেলেছে ঘরের পথে ফিরতে পেরে। জলে ভাসমান কচুরিপানার কাফেলা, ব্যাপারীর হাঁক-ডাক, যাত্রীবাহী লঞ্চে মানুষজনের ওঠানামা, ঘাটের মানুষের হইচই হট্টগোল, মাছমারা ট্রলারের দক্ষিণ সাগর অভিমুখে যাত্রা, সব মিলিয়ে লেখকের মনোজগতের বাস্তুভূমিকে অন্যধারায় প্রবাহিত করেছে। সে কথা তিনি নিজে মুখে স্বীকার করেছেন এভাবে—

সব মিলিয়ে এক বিগত কালের স্বাদ, অনুভূতি পাচ্ছি। নদীর ধারের এই পরিবেশ আমার কাছে শাশ্বতপ্রায় ছবি। এর প্রতিটি রং, শব্দ, ছন্দ, ভাষা বা এর পুরো অবয়ব এবং আত্মাটিও যেন আমার একান্ত পরিচিত। মাঝের কয়েক বছরের নাগরিক বিচ্ছিন্নতা বাদ দিলে আমিও তো এর অংশ, অথবা সব মানুষই কি তাই নয়?[৩১]

লেখক চন্দ্রদ্বীপ-সন্তান। তাঁর পদচারণা, কথা বলার ভঙ্গিমায় লেগে রয়েছে চন্দ্রদ্বীপের

সুবাস। নদীর বুকে ভেসে যেতে যেতে পাড়ের বৃক্ষরাজি চিনে ফেলে ঘরের সন্তানকে। কাছে ডেকেছে দু-দণ্ড জিরিয়ে নেওয়ার জন্য। মায়ের মতো তারাও সন্তানের মঙ্গল কামনায় রত। মায়ের মতো তারাও আদর করতে জানে—

...প্রান্তিক বৃক্ষ আত্মজনেরা বলছেন— ররররর। বলছেন, খাড়অ, দণ্ড দুই জিরাইয়া যা। নাও হান বান্দ্ মোর শেহড়ে। যাবি যেন কই? বলি— সিদ্ধিগঞ্জের মোকামে। বৃক্ষ বলে— ধীরে সুস্থে যা, দৌড়াইস্ না। বৃক্ষের কথা শুনে ট্রলার তার শেকড়ের কাছে কাছে নামিয়ে দেয়। বৃক্ষ পাতা খসিয়ে সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, আর বলে, তোরা বেয়াকে সুখে থাক। বেয়াক মানুষ সুখী হউক। বালামুসিবৎ দূর হউক।[৩২]

খুব প্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন আসে মনে, এর পূর্বে কলকাতা বাসের সময় কি কোনো দিনও লেখকের গায়ের ওপর পাতা ঝরে পড়েনি? কখনো নদীর পাড়ের কোনো গাছ লেখককে সাবধানতার কথা শোনায়নি? শোনালেও শুনিয়ে থাকতে পারে, তবে তাতে মায়ের স্পর্শ ছিল না। আর তা থাকলে লেখকের এই আর্তি বা আকুতি এভাবে ফুটে উঠত না। কর্মক্লান্ত ঘর্মগায়ে মায়ের কোলে ফিরে সবাই চাই একটু সুখানুভূতির। আর তা চাইতেই তো সিদ্ধিগঞ্জের দিকে যাত্রা করেছেন লেখক। জীবনের অনেকটা বছর কেটে গেছে, তবুও দেশের প্রতি, শিকড়ের প্রতি টান কমে যায়নি বিন্দুমাত্র। শেকড়ের খোঁজে উৎসের অভিমুখে এই যাত্রার নামই তো উজান যাত্রা।

সাত.

মিহির সেনগুপ্তের সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম পড়তে পড়তে বারবার মনে একটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল যে, মানুষ উজান যাত্রা করে কেন? কীসের টানে সে উৎসের অভিমুখে ছুটে যায়? মনে মনে একটা উত্তর সাজাবার চেষ্টা করেছি আমি। মানুষ বাড়ি ছাড়ে বিশেষ কোনো কাজের তাগিদে। যখন সে তার উদ্দেশ্যে সফল হয় বা ব্যর্থ হয় তখন সে অনুভব করে বাড়ি ফেরার টান। এই বাড়ি যেখানে থাকে সেটাই তার দেশ, সেটাই তার বাস্তুভূমি। সেই ‘দেশ’-এর প্রবল আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারে না সে। মনে পড়তে থাকে তার বাল্যকাল, শৈশব, খেলে আসা দিন, ফেলে আসা দিনের কথা। চেনা রং হাতছানি দিয়ে ডাকে। চেনা স্পর্শের আরও একবার ছোঁয়ার আহ্বান পায় সে,
অন্তর থেকে। আর সেখানে ফিরে আসতে পারলেই তার পূর্ণ হয় সব চাওয়া-পাওয়া। আর এই পূর্ণতা প্রাপ্তির অপর নাম ‘সিদ্ধি’। লেখক কী সিদ্ধিগঞ্জের মধ্যে দিয়ে সেই সিদ্ধিলাভের কথাই বলতে চেয়েছেন। ‘মোকাম’ অর্থে আস্তানা বা আবাস স্থল। আর

সেই আস্তানা বা আবাস স্থল হল তাঁর প্রিয় দেশভূমি, সাতপুরুষের ভিটা। আর এখানেই তো তাঁর মুক্তি লুকিয়ে রয়েছে। এ মুক্তি আত্মার মুক্তি, হৃদয়ের মুক্তি, মানবতার মুক্তি। লেখক বলেছেন—

> সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম। সে মোকামের ঠিকানা একেকজনের কাছে একেক রকম। কেউ বা প্রযত্নে থাকে মঠ-মন্দির-মসজিদ-গির্জার, কেউ বা আবার গগনচুম্বি অট্টালিকার, সাতমহলা বাড়ির, ধন-ঐশ্বর্যের চোখধাঁধানো সমারোহের। আমার সিদ্ধিগঞ্জের মোকামখানা রয়েছে আমার হৃদয়েশ্বরী জলেশ্বরীর কোলের মধ্যে। সেখানে ভূপ্রকৃতির ইতিহাস নবীন কিন্তু মানুষ প্রাচীন। সে এখনও আধুনিকতার ধরতাই-এ হাঁটি হাঁটি পা পা। তার কথার লজে, চলার ছন্দে সামন্ত-পরম্পরার শ্লথ ভাবটি এখনও প্রবল। তথাপি হৃদয়বৃত্তের অলখ বলয়ের সাতরঙের হাতছানিতে সে আমাকে পৌঁছোয় যে স্থানে, সেই আমার মোকাম— আমার সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম।[৩৩]

অবশেষে লেখক তার সন্ধান পান। দুচোখ ভরে দেখার সুযোগ পান। একদিন তিনি এখান থেকেই পাড়ি জমিয়েছিলেন অজানা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে। তারপর শুধু সময়ের খেলা। পৃথিবীর জনসমুদ্রে ভেসে বেড়ানো। অমূল্য নামের এক মানুষ লেখককে বলেছিল, যার চোখের মধ্যে 'জগৎজোড়া চৌখের চাহুনি' সেই মানুষটাই প্রকৃত আত্মীয়। আর সেই চোখ, সেই আত্মীয়ের খোঁজে লেখকের যাত্রা সিদ্ধিগঞ্জের মোকামের উদ্দেশ্যে। কালীগঙ্গার জলে ভাসার পরেই তিনি দেখতে পেয়েছেন সেই 'পাখি-ধরা আঁখির'। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন সে কথা—

> অবশেষে তার সন্ধান পাই কালীগঙ্গার পারের এক হিজল-কাশ-হোগল-নলখাগড়ার ঝোপে। আর সেই হল কাল। এখন ঘাসে শিশির পড়লেই পা চঞ্চল, এই হল আমার সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম। একদা এখান থেকেই দেহতরী ভাসিয়েছিলাম গোনে, তাই এখন উজানযাত্রায় যাই সিদ্ধিগঞ্জের মোকামে। কালীগঙ্গার শেষ ঘাট আমার সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম।
> হোগল, কাশ, নলখাগড়ার ঝোপের মধ্যে থাকে আবার এক মুখ। সে মুখের কোনো বাস্তব অবয়ব নেই। আমার কাছেও বা। সে এক বিশাল বিস্তার নদীতে ভাসে। নদীর নাম জানি— ওই কালীগঙ্গা। মুখের নাম, সাধ করে রাখি জলেশ্বরী। সেই মুখ দেখতে যাওয়া। ওখানে আমার সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম।[৩৪]

এবার কেবল রোমন্থনের পালা। ভিড় করে আসার পালা সেই সব ফেলে আসা অতীতের। তাদের সুখানুভূতির স্পর্শ নিজেকে স্নাপনের পালা। দেশের মাটি, মায়ের কোল ফিরে পেয়েছেন লেখক। হয়তো তা সাময়িক, কিন্তু অনেক অনেক দিন পর। ফিরে আসবেন আবার নাগরিক কোলাহলের শহরে, ব্যস্ত হয়ে পড়বেন আবার রুক্ষ

বাস্তবের সাথে পা মিলিয়ে চলতে, তবু যেটুকু সময় পাওয়া গেছে চিত্রগুপ্তের খাতা থেকে তার সঙ্গে আর কোনো কিছুর আপোষ নয়। কেবল নাওয়ের হালটা ধরে আবেগমথিত 'আঁখি-পাখি' সোনালি ডানা চায় মেলে দিতে সিদ্ধিগঞ্জের দিকে।

আট.

কথক একাকী সিদ্ধিগঞ্জের মোকামে যাননি, সাথে নিয়ে গেছেন পাঠককে, শাশ্বতকালের মানুষকে। তাঁর যাত্রাপথের বিস্তৃতিতে যে আবেগের ঢেউ উঠেছে, তা তাঁর একক নয়— দেশ ছাড়া, পরবাসী, অভিবাসী সকল মানুষের। শিকড়ের টানে ঘরে ফিরতে চাওয়া কোটি মানুষের একজন হয়ে কথা বলেছেন। বলতে চেয়েছেন জীবনের টান গৃহাভিমুখী। সবাই দেশের মাটিতে, দেশের মানুষের সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্নই দেখে। তা কখনো পূর্ণতা পায়, কখনো পায় না। যেমন খলিল ঠাকুরের বিবি বাপের বাড়ি চলে গিয়ে আর ফিরে আসেনি, সংসার ধর্মে পূর্ণতা পায়নি। কিন্তু রায়বাড়ির একজন সদস্য হয়েই থেকে গেছে এখনো, সেই ছোটবেলা থেকেই। এখানেই খলিলের পূর্ণতা প্রাপ্তি। সরস্বতী পেয়েছে পূর্ণতা, ঘর করেছে সে দৌলতের সাথে, সন্তান এনেছে বিশ্ব আলোকে। দৌলতের মৃত্যুর পরে আবার সে ঘর বেঁধেছে অষ্টচরণ দাসের সাথে। ঘর ভেঙেছে বলে, পুনরায় ঘর না বাঁধার পণ করেনি সে। কেননা, সে জানে মিলিত শক্তি দিয়েই দুর্যোগকে জয় করা যায়। তার পাশে থেকেছে বাকিরা সবাই। দুর্গা পূজার আসরে এই কাহিনি সবাইকে শোনায় ছোমেদ বয়াতি—

> ছোমেদের শেষ গান এক স্থানীয় ট্রাজেডি নিয়ে। ওদেরই জীবিকাসূত্রে স্বজাতি নিকিরি দৌলত আর জালিয়াকন্যা সরস্বতীর রোমান্সের কাহিনী। বাপ-দাদা কর্মসূত্রে এক, এই সুবাদে রূপসী সরস্বতীকে সে দাবি করে ধর্মের বাধা না মেনে। সমাজের বাধা ভেঙে তাদের প্রেম জয়ী হয়। কিন্তু সে জয় ক্ষণস্থায়ী। প্রিয়ার অশ্রু উপেক্ষা করে সাগরে যায় দৌলত। দরিদ্র জালিকের এই বিপদ মাথায় না নিয়ে উপায় নেই। নদীর মোহনায় তার মৃত্যু— ভেদবমি হয়ে। নিরুপায় বিধবা সরস্বতী পুরুষের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচতে দৌলতের হিন্দু সখা অষ্টের গৃহিণী হতে স্বীকার করে। দৌলত আর সরস্বতীর সন্তান কানাই আশ্রয় পায় নিঃসন্তান কার্তিকের ঘরে।[৩৫]

কেন শুনিয়েছিল সে এই গান? কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য কী তার ছিল? আসলে, মিলনের গান শুনিয়ে সে বোঝাতে চেয়েছিল চণ্ডীদাসের সার কথা— 'শুনহ মানুষভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। হিন্দু মুসলিম ভেদাভেদ ভুলে আসরে উপস্থিত সব মানুষকে এক হওয়ার আমন্ত্রণ ছিল তার কণ্ঠে। আসরে কারা ছিল? সেই সব

বঞ্চিত, শোষিত, অত্যাচারিত একদল সংখ্যালঘু হিন্দু মুসলিম মানুষ। কিংবা, ছোমেদ সে গান শুনিয়েছিল নিজেদের, আত্মবেদনায় পুড়িয়ে আত্মশুদ্ধির পথ বলে দিতে। বেদনার মরমীয়া সুরে নিজেদের খুঁজে পেতে।

দেশভাগ, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, মুক্তিযুদ্ধ পেরিয়ে যে সব মানুষ এখনো বেঁচে থাকার আশায় বুক বেঁধে আছে তাঁদের সাথে নিজেকে মিলিয়ে দেখেছেন আখ্যানকার। নানান কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি একের পর এক ছবি দেখছেন আর তা তুলে দিচ্ছেন পাঠকের হাতে। সমবেদনার হাত, সহানুভূতির হাত তারা বাড়িয়ে দিয়েছে একে-অন্যকে। এই দৃশ্য দেখার জন্যেই তো দীর্ঘ সময় পরেও ফিরে আসা। চোখের সার্থকতা তো এখানেই। সমালোচক লেখকের অনুভূতির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

এইসব মোকদ্দমা-বিষয়ক কাজের মধ্যে সময়ের হালকা স্রোতে ভাসতে ভাসতে লেখকের 'চোখ দুটি শুধু কাজ করে যাচ্ছে। ছবির পর ছবি দেখছি। স্পর্শেন্দ্রিয়ে নিচ্ছি এক জৈবিক অনুভব। মগজ নয়, হৃদয় শুধু জানান দিচ্ছে তার ব্যথা বা আনন্দের সংবেদন'। আর লেখকের এই সংবেদন চুঁইয়ে পড়ছে তাঁর এই আলেখ্যর পরতে পরতে।

স্বভূমের যাত্রাপথে এক একটি চরিত্র আসতে থাকে; প্রায় সবই অপবর্গীয় মানুষ, কিন্তু স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এই মহিমার মধ্যে নৈতিকতা খোঁজার চেষ্টা বৃথা। সকলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সহজ স্বাভাবিকতায় জীবনের স্রোতে ভেসে থাকার মধ্যেই নিহিত তাদের মহিমা।[৩৬]

উজান বাইতে গিয়ে ছোমেদের কথায় দ্বন্দ্ব এসেছে শোষণ-বঞ্চনার, জাতি-ধর্মের এবং 'তথাকথিত নাগরিক মর্ডানিটির সাথে অপবর্গীর ভূমিগত অবস্থানের'। রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক কোনো সংস্কার তাদের আপাতসনাতন মনে দাগ কাটতে পারে না কখনো। কারণ, তারা সব কিছুই নিজস্ব কষ্টিপাথরে ঘসে যাচাই করে নেয়। এখানে পরিবর্তনের 'কুবাতাস' প্রবেশাধিকার পায়নি এখনো, তবুও ফাঁক-ফোকর দিয়ে অতিধীর একটা বদলের আভাস কখনো কখনো নজরে আসে। এখানের জল-হাওয়া-মাটির গুণে প্রাণের স্পন্দনের লয় অতি মৃদু, মন্দাক্রান্তা।

যুক্তি, অনুভবকে বা হৃদয়বৃত্তিকে সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করতে পারে না। সে খোঁজে কার্য-কারণ সম্পর্ক, বাস্তবের জটিল প্রকৃতি, চেতনার অভিপ্রায়। বিবেকের দাম নেই কোনো। 'সস্তার মানবতা'-র ওপর চেপে বসে যুক্তিবোধ। খেয়ালি অন্তরাত্মা হাঁটতে থাকে মরমীয়া পথে, যে পথে সিদ্ধি আসে এগিয়ে। সাধনায় যুক্তি-তক্কোর তক্তাপোশ মানায় না, তাই রাখেও না কেউ। সাধনার পথে হালকা হতে চেয়ে সবাই ছেড়ে আসতে চায় তুচ্ছ জাগতিক বস্তু। লেখকও সব ছেড়ে এসেছেন নগরের ভীড়ে,

ব্যস্ততার শহরে। ছোমেদ, মোকছেদ, খলিল, নসু, কার্তিকদের কাছে ধর্মের বা জাতির কোনো আড়ম্বর নেই, উত্তেজনা আছে প্রাণের। ক্ষমতা আছে হাজার অভাবকে স্বভাব দিয়ে জয় করে নেওয়ার। তারা তা পারেও। ব্যর্থতা তাদের ছুঁতে পারে না, তারা যে মানবতার পূজারী, তারা যে মননের সাধক। তারাই তো শিকড়ের মূল। তাদের মধ্যে দিয়েই তো প্রাণের সঞ্চার ঘটে শিকড়ে। তাদের টানেই তো উজান যাত্রা মানুষের, কথকের। তাদের স্পর্শেই তো সিদ্ধিলাভ মানুষের, কথকের। তাদের কাছে পৌঁছানোর পথই তো সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম, মানুষের কিংবা লেখকের। এই পথেই যে প্রোথিত বীজপুরুষের স্মৃতি, আর হাতছানি দেয় তাদের প্রতিভূ।

তথ্যসূত্র:

১. সেনগুপ্ত, মিহির, *সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম,* প্রথম সুপ্রকাশ সংস্করণ: সেপ্টেম্বর, ২০২০, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, দ্র. 'আগে পিছের কথা'

২. সেনগুপ্ত, মিহির, *সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম,* পূর্বোক্ত, 'প্রাক্-কথন', পৃ. ১২

৩. সেনগুপ্ত, মিহির, *সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম,* পূর্বোক্ত, দ্র. 'আগে পিছের কথা'

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪-২১৫

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩-২৪৪

২৬. গোস্বামী, অর্ধেন্দুশেখর, 'মিহির সেনগুপ্ত'র সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম— উজাগর রাত্রির এক পরাণকথা', গোস্বামী, অর্ধেন্দুশেখর (সম্পা.), *পরবাস*, সংখ্যা-৮২, ১৪ এপ্রিল, ২০২১

লিঙ্ক: https://www.parabaas.com/PB82/LEKHA/brArdhendusekhar82.shtml

২৭. সিংহ, কঙ্কর, *দেশভাগ সংখ্যালঘু সঙ্কট বাংলাদেশ*, 'অমুসলমান সংখ্যালঘুরা কী বাংলাদেশে থাকতে পারবেন?', আমরা: এক সচেতন প্রয়াস প্রকাশনা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০১১

২৮. খালেদ, সারোয়ার, 'বাংলাদেশে কতখানি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হতে পারে?', কবীর, আলতামাশ (সম্পা.), *সংবাদ* , ঢাকা, ১৭ নভেম্বর, ২০০১

সূত্র: সিংহ, কঙ্কর, দেশভাগ সংখ্যালঘু সঙ্কট বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত

২৯. সেনগুপ্ত, মিহির, *সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম* , পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১-৬২

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫

৩৩. পূর্বোক্ত, 'প্রাক্-কথন', পৃ. ১১

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৩৫. রায়চৌধুরী, তপন, 'অচেনা পিতৃভূমি, অজানা আত্মজন', নন্দন পত্রিকা,

সূত্র: *সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২-২৫৩

৩৬. গোস্বামী, অর্ধেন্দুশেখর, 'মিহির সেনগুপ্ত'র সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম— উজাগর রাত্রির এক পরাণকথা', পূর্বোক্ত